STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ডিসেম্বর ২০১৮
নবপর্যায় ৬৮
মূল্য ১০ টাকা

সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন: রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন।

পরিষদ বার্তা'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচনে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হলে রানা দাশগুপ্ত বলেন, এবারের নির্বাচনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতাকে কোনো রাজনৈতিক দল ব্যবহার করেনি। আমরা এটিকে ইতিবাচক মনে করি। আমরা এ জন্য সরকার, নির্বাচন কমিশনসহ সব রাজনৈতিক দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অবশ্য নির্বাচনের আগে ও পরে বেশ কয়েকটি জেলায় অনাকাঙ্খিত ঘটনার উল্লেখ করে রানা দাশগুপ্ত বলেন, নির্বাচনের আগে-পরে ফেনীর সোনাগাজী, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা, পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিসহ কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের কাউকে কাউকে আটক করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এতে সংখ্যালঘু জনমনে আশা ও আস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে।

সংসদনেতা নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে রানা দাশগুপ্ত বলেন, আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্টভাবে তার নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক নির্মূলের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' (শূন্য সহিষ্ণুতা) নীতির অঙ্গীকার করেছে। এটি আক্ষরিকভাবে কার্যকর করতে নতুন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

রানা দাশগুপ্ত আরও বলেন, এবারের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সুস্পষ্ট যে অঙ্গীকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছে, তা যথার্থভাবে পালন করবে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

১৮ সংখ্যালঘু সংসদে, ঐক্য পরিষদ ইতিবাচক হিসেবে দেখছে

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন ১৮টি আসনে। এর আগে ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনেও ১৮ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী জয়ী হন।

এবারের সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিলেন ৭৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন নারী এবং ২ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেন।

সবচেয়ে বেশি ১৮ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগে। তাঁরা সবাই জিতেছেন। বিএনপি ছয়জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলেও তাঁদের কেউ জিততে পারেননি।

যেসব সংসদীয় আসনে সংখ্যালঘু ভোটার অপেক্ষাকৃত বেশি, সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো সেসব আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ১৮ জন প্রার্থীর ১৬ জনের নির্বাচনি এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটার ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। বাকি দুটি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটার ১০ শতাংশের মতো।

সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু প্রার্থীরা হলেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে রমেশ চন্দ্র সেন, দিনাজপুর-১ পৃষ্ঠা ২

যে নির্বাচন দুই অস্ত্রকে ভোঁতা করে দিয়েছে

।। পর্যবেক্ষক ।।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গত ৪৭ বছরের ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে দু'টি ক্ষেত্রে। এবার ভারত-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা নির্বাচনী প্রচারণায় অনুপস্থিত ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এক নদী রক্তের বিনিময়ে, যে রক্তস্রোতে এক হয়ে গিয়েছিল মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর জওয়ানদের রক্ত। ভারত বাংলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত বন্ধুতে পরিণত হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) পাকিস্তানি পৃষ্ঠা ৭

ভোট শেষ, কিন্তু ভয়াল দুঃস্বপ্ন থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি ওরা

॥ ফরিদপুর থেকে ফিরে পদ্মাবতী দেবী ॥

ফরিদপুরে ভাঙা উপজেলায় নির্বাচনের দিন হামলার নৃশংসতা ও ভয়াবহতা একাত্তর সালকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কাউলিপাড়া ইউনিয়নের খাটরা গ্রাম, নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ভদ্রকান্দা গ্রাম ও কালামৃধা ইউনিয়নের দোলকুন্ডি গ্রামের আক্রান্ত মানুষ যে নৃশংসতার মুখোমুখি হয়েছেন, তার ভয়াল দুঃস্বপ্ন থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফরিদপুর-৪ এই আসনের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে প্রার্থী ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাজী জাফর উল্লাহ, তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহ প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিক্সন চৌধুরী। স্বতন্ত্র প্রার্থীই এই আসনে জয়লাভ করেন।

পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পারি, নির্বাচনের দিনই হামলা শুরু হয়ে যায় বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে। দিন ও রাতভর হামলা চলে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ছাড়াও সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ওপরও হামলা চালানো হয়। আক্রান্ত মানুষদের অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই গ্রামগুলোতে হামলা করেনি। আক্রান্তদের অপরাধ ছিল নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া। এই অপরাধে বাড়িঘর, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হামলার শিকার হয়। এই পরিদর্শনের সময় ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক চন্দন ভৌমিক সঙ্গে ছিলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভাঙা উপজেলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি জগদীশ চন্দ্র মালো ও সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর উপস্থিত ছিলেন।

খাটরা গ্রামে প্রথমে হামলা শুরু হয় নিখিল কুমার সরকারের বাড়িতে। তিনি সরকারি চাকুরে, অন্যত্র ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দায়িত্বরত ছিলেন। এই গ্রামে প্রায় ৭০টি হিন্দু পরিবারের বাস। এলাকায় নেতৃস্থানীয় নিখিল বাবুর বাড়ি থেকে ৬/৭ ভরি গয়না, নগদ আড়াই লাখ টাকা, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, শ্যালো ইঞ্জিন, ধান মাড়াই কল লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। নিখিল বাবুর তিন মেয়ে, তাদের হামলার আঁচ পেয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া পরেশ মাতবর, সুনীল বিশ্বাস, পলাশ হাওলাদার, সত্য কর্মকার, সর্বেশ্বর হাওলাদার, আবদুর রব ফকির, শহীদ মিয়া, আশরাফ ফকির, সিরাজ মাতবর, খোকা বিশ্বাস, গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা সোনার গয়না ও ভাংচুর করা হয়। হিন্দু মহিলারা মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব ফকিরের বাড়িতে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই অপরাধে তার বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। বাচ্চাদেরও মারধোর করা হয়, ফকিরের এম এ পাশ মেয়ের হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, পরাজয়ের আশঙ্কা থেকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকরা নিখিলবাবুর বাড়িতে প্রথমে হামলা শুরু করে, পরে বিস্তৃত হয় হামলা। আবার পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরাই হামলা চালায়। গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা করে নগদ টাকা ও সোনার গয়না লুট করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা।

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ভদ্রকান্দা গ্রামে গিয়ে জানা যায়, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ পৃষ্ঠা ২

ধ্বংসের ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িঘর — পরিষদ বার্তা

ফরিদপুরে হামলার আরও চিত্র

ভয়াল দুঃস্বপ্ন থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি ওরা

প্রথম পাতার পর

সভাপতি মানিক সরকার, বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ভুবন সরকার ও জয়দেব সরকারের বাড়িতে হামলা চালানো হয় নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে। অভিযোগ করা হয়, সিংহ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকরা এই হামলা চালায়। আসবাবপত্র ভাংচুর করে, শিশুদের মারধোর করে এবং মহিলাদের গয়না খুলে নিয়ে যায়। কানাই সিকদার, স্বপন সরকার মানিক সরকারের বাড়ির শরিক। তাদের ঘরেও হামলা চালানো হয়। শেখ শাহীনের বাড়ি থেকে নগদ ১৫ লাখ টাকা, ৩৫/৩৮ ভরি সোনার গয়না লুট করা হয়। বাড়ির মহিলারা পাশের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয়।

এর আগে ১৭ ডিসেম্বর এলাকায় একটি বারোয়ারী মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও বিগ্রহ ভাংচুর করা হয়। নির্বাচনের পর সার্বজনীন কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে কালী মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। কালমৃধা বাজারে নির্বাচনী সহিংসতায় ১৪/১৫টি দোকান লুট হয়েছে, যার মধ্যে ৭টি হিন্দুর দোকান। কালমৃধা ইউনিয়নের দোলকুন্ডি গ্রামের হামলা চালানো হয় দুলাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর খলিফা, আনন্দ সাহা, শংকর সাহা, সুমন বিলুয়া, ইসকান্দার খলিফা, কৃষ্ণ, কানাই ঘোষ, সঞ্জয় কর্মকার, গোবিন্দ মালো, ভমো মালো, পরিমল দত্ত, রাধেশ্যাম সাহা ও ভবেশ চন্দ্র রায়ের বাড়িঘর ও সোনার দোকানে। অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের দিকে।

যেখানে, যে বাড়িতে গেছি, আর্তনাদ শুনেছি, আমরা কীভাবে বাঁচবো! এক দলের প্রার্থীকে ভোট দিলে অন্য প্রার্থীর সমর্থক-কর্মীরা হামলা চালায়। কোন প্রার্থীই আমাদের সুরক্ষা দেয় না।

১৮ সংখ্যালঘু সংসদে, ঐক্য পরিষদ ইতিবাচক হিসেবে দেখছে

প্রথম পাতার পর

মনোরঞ্জন শীল গোপাল, নওগাঁ-১ সাধন চন্দ্র মজুমদার, যশোর-৪ রণজিত কুমার রায়, যশোর-৫ স্বপন ভট্টাচার্য্য, মাগুরা-২ বীরেন শিকদার, খুলনা-১ পঞ্চানন বিশ্বাস, খুলনা-৫ নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, বরগুনা-১ ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, বরিশাল-৪ পঙ্কজ নাথ, ময়মনসিংহ-১ জুয়েল আরেং, নেত্রকোনা-১ মানু মজুমদার, নেত্রকোনা-৩ অসীম কুমার উকিল, মুন্সিগঞ্জ-৩ মৃণাল কান্তি দাস, সুনামগঞ্জ-২ জয়া সেনগুপ্তা, খাগড়াছড়ি কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রাঙামাটি দীপংকর তালুকদার, বান্দরবান বীর বাহাদুর উ শৈ সিং। তাঁদের মধ্যে মানু মজুমদার ও অসীম কুমার উকিল বাদে অন্য ১৬ জন আগেও সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অবস্থান জানতে চাওয়া হলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, যা পেলাম তাতে তুষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে সংখ্যালঘু প্রার্থীদের বিজয়কে ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই। সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও অংশীদারত্বের জন্য জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘুদের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবি

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাতে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দ। গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মোমিন রোডস্থ মৈত্রী ভবনের হিন্দু ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বর্ধিত সভায় এ দাবি জানানো হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় আলমপুর গ্রামে ৫টি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা হিন্দু জনগোষ্ঠীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টির পূর্বাভাষ বলে উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ অতীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চিত্র বর্ণনা করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার না হয় তার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার পালিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বিপুল কান্তি দত্ত, বিজয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব, তুষার সিংহ হাজারী, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দেব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পালিত, উত্তম শর্মা, অলক মহাজন, অশোক কুমার নাথ, অর্থ সম্পাদক সুমন দে, সাংগঠনিক সম্পাদক কল্লোল সেন, দোলন মজুমদার, সাগর মিত্র, বিকাশ মজুমদার, প্রচার সম্পাদক রিমন মুহুরী, ডাঃ দেবাশীষ মজুমদার, টিটো শীল, তাপস চৌধুরী, প্রকৌশলী রতন দাশ, অমিত লালা, এ্যাড. মিহির দে, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, কাজল শীল, দিলীপ শীল, অপু বৈদ্য, ডাঃ রাজেশ দেব প্রমুখ।

বিমল রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে ঐক্য পরিষদের শোক

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য বিমল রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তম, হিউবার্ট গোমেজ, উষাতন তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত।

এক শোক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বিমল রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশ গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের পৰের একজন নির্ভীক যোদ্ধাকে হারালো।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের আশাবাদ

নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে ঘোষিত অঙ্গীকার নিয়ে গত ২১ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন যে লিখিত বক্তব্য রাখা হয় তা নির্বাচনের পরও প্রাসঙ্গিক। কারণ এই অঙ্গীকার কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা আলোচনার দাবি রাখে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-র চেতনা নিয়ে জাতীয় পার্টি তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ১৪টি প্রতিশ্রুতি জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে। 'বাঙালি' বা 'বাংলাদেশী'-এ দু'য়ের কোন জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা এখানে উল্লেখিত নেই। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ৭২-র সংবিধানের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) 'রুটি রুজি অধিকারের জন্য শোষণ-বৈষম্যহীন ইনসাফের সমাজ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে তার নির্বাচনী ইশতেহার 'ভিশন-মুক্তিযুদ্ধ ৭১'-এ শিরোনামে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে। আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী' চেতনাকে ধারণ করে 'ঐকমত্য, সকলের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিহিংসাহীনতা'-এই মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার অংগীকার নিয়ে তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে।

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ও স্বার্থরক্ষা এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটিভুক্ত ২৩টি সংগঠনকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের মহাসমাবেশ থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৭-দফা দাবিনামা গৃহীত হয়। ঐ ৭-দফা দাবিনামায় 'ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা'র অনুচ্ছেদ সম্বলিত ১(ক) দফায় জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে যুক্ত নির্বাচনের (সার্বজনীন ভোটের) ভিত্তিতে ৬০টি আসন সংরক্ষণ, ১(খ) দফায় সাংবিধানিক পদসহ প্রশাসনিক কাঠামো ও সরকারী চাকুরীর সর্বস্তরে ২০% পদায়ন সুনিশ্চিত করা; 'সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ' সম্বলিত অনুচ্ছেদের ২(ক) দফায় রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কীয় সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক ২ক অনুচেছদের বিলোপ করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌল আদলে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, ২(খ) দফায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারের ও পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয়া; 'সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা' সম্বলিত অনুচ্ছেদের ৩(ক) দফায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও সমতলের আদিবাসীদের কল্যাণে ও উন্নয়নে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, ৩(গ) দফায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা; 'স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন' সম্বলিত ৪(ক) দফায় পার্বত্য শান্তি চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন ও পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের অনতিবিলম্বে কার্যকরীকরণ, ৪(খ) দফায় সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের নিমিত্তে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমির অধিকার সুনিশ্চিত করা, ৪(গ) দফায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন ও ৪(ঙ) দফায় অধিকতর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হরিজন, দলিত, ঋষি সম্প্রদায় এবং অবহেলিত চা শ্রমিকদের সামাজিক কল্যাণে সকল প্রকারের সামাজিক বৈষম্য নিরসনে বিশেষ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষিত হরিজন, দলিত, ঋষি জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী কোটার মাধ্যমে নিয়োগের নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন; 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ' সম্বলিত ৬(ক) দফায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের নিরাপত্তার সুনিশ্চিতকরণার্থে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, ৬(খ) দফায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ' সম্বলিত অনুচ্ছেদের ৭ নম্বর দফায় যে কোন ধরণের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বর্ণবৈষম্য ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপরোধে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নেয়ার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিতকরণের দাবি উল্লেখিত রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে যে ৫-দফা দাবি গৃহীত হয়েছিল তার ৫ নম্বর দফায় এ দাবিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উত্থাপিত হয়।

সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠা মানবাধিকারের আন্দোলন একেবারে বৃথা যায় নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, এ দেশের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ১২% ভোটারের ন্যায়সংগত দাবিগুলোকে এ প্রথমবারের মতো সুস্পষ্টভাবে আমলে নেয়ার চেষ্টা করেছে। অতীতের মতো বিবেচনার একেবারে বাইরে রাখার চেষ্টা করে নি বা অস্পষ্টভাবে তুলে ধরে নি।

জাতীয় পার্টি তার নির্বাচনী ইশতেহারের, 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা' সম্বলিত ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে-

● সাধারণ নির্বাচন বাদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত করা হবে। সে ক্ষেত্রে সংসদের মোট আসন সংখ্যা হবে ৩৮০। এর জন্যে সংবিধানে সংশোধনী আনা হবে

● সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যার হার অনুসারে তাদের চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে

● ধর্মীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে

লক্ষণীয়, জাতীয় পার্টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে ইশতেহারে একেবারেই নিশ্চুপ।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তার ১৪টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির 'নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা' সম্বলিত ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বিবৃত করেছে-

● সংখ্যালঘু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদা, অধিকার, নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদের উপর যে কোন রকম হামলার বিচার হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে।

লক্ষ্যণীয়, জাতীয় পার্টির মতো জাতীয় ঐক্যফ্রন্টও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিতকরণের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংবিধান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতির সংস্কার সাধন' সম্বলিত ১ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে-

(ক) রাষ্ট্র পরিচালনার সব ক্ষেত্রে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের চার মূলনীতির সঙ্গে বিদ্যমান সংবিধানের সাংঘর্ষিক সব বিধিবিধান বাতিল করা

(গ) প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রসার এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠী ও অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও বিকাশের অধিকার রক্ষা করা

(ঙ) ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক সব আইন ও বিধি বিলোপ করা

(ছ) নাগরিকদের স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রচারণা নিষিদ্ধ করা। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা।

'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যরোধ এবং তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা' সম্বলিত সিপিবি'র ইশতেহারের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে-

(ক) সব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সমান মর্যাদা এবং তাদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর উৎপীড়ন, বৈষম্য, হয়রানি বন্ধ করা। এ জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু (অধিকার রক্ষা) কমিশন গঠন করা

(খ) কুখ্যাত 'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন' বাতিল করা। সম্পত্তির উপর অংশীদারদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং এই আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করে বঞ্চিতদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া

(গ) সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে সব ধরণের সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা

'বিভিন্ন জাতিসত্তা, আদিবাসী সমাজ ও দলিতদের যথাযথ স্বীকৃতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা' সম্বলিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে-

(ক) আদিবাসী হিসেবে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বকীয়তার পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান এবং সেই অনুসারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ

(খ) বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং বিকাশের জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। সব জাতিসত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষার শিক্ষা দেয়ার এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আদিবাসীদের উপর হত্যা, অত্যাচার, উৎপীড়নের ঘটনার বিচার করা

(গ) ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চুক্তির' পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে গঠিত 'ভূমি কমিশন' সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জমি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা

(ঘ) সমতল ভূমির সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওরাওসহ সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে একটি 'ভূমি কমিশন' গঠন করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার খাস জমি বন্টনে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। এ বিষয়ে ১৯৫০ সালের ভূমি স্বত্ব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

(ঙ) দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান সব বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূর করা। অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষে একটি কমিশন গঠন করা। নবগঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশেষ সেল গঠন করা।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র ওয়েবসাইট থেকে তাদের পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী ইশতেহার পাওয়া যায় নি। তবে, দলের মহাসচিব কর্তৃক পঠিত ইশতেহারের সারাংশ থেকে দেখা যায়, তাতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' শীর্ষক এক অনুচ্ছেদ রয়েছে। এতে উল্লেখ আছে-

● পাহাড়ী ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ও মর্যাদা সুরক্ষা করা হবে। অনগ্রসর পাহাড়ী ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকুরী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল সুবিধা এবং পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

● দল, মত, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার এবং জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তার বিধান করা হবে। এই লক্ষে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ ও মাদক নির্মুল'কে অন্যতম বিশেষ অঙ্গীকার হিসেবে ঘোষণা করে এ সম্পর্কে ইশতেহারের ৩.৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

● আগামিতে জঙ্গীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি সরকারের দৃঢ় অবস্থান থাকবে

● সন্ত্রাসী-গডফাদারদের এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে

● সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে

'তরুণ যুবসমাজ: তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' সম্বলিত ৩.১১ নম্বর অনুচ্ছেদে 'আত্মকর্মসংস্থান ও তরুণ উদ্যোক্তা তৈরী' বিষয়ে ইশতেহারে লিপি আছে-

● উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও জঙ্গীবাদের প্রথম লক্ষ্য যুব সমাজকে আকৃষ্ট করা। এই যুব সমাজ যাতে আদর্শিক ভ্রান্তিতে মোহাবিষ্ট হয়ে জঙ্গী তৎপরতায় যুক্ত না হয়, সে জন্য কাউন্সিলিং এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে

'শিক্ষা সম্বলিত ইশতেহারের ৩.১৮ নম্বর অনুচ্ছেদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে বলা আছে-

● নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় সকল বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।

তবে, অস্বীকারের কোন উপায় নেই, শিক্ষা ব্যবস্থায় অদ্যাবধি বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে কোন অঙ্গীকার ইশতেহারে ব্যক্ত করা হয় নি।

আওয়ামী লীগের ইশতেহারের ৩.২৫ নম্বরে অনুচ্ছেদে 'দলিত অবহেলিত গোষ্ঠী' শিরোনামে বিবৃত আছে-

● বেদে, হরিজন, দলিতসহ সকল গোষ্ঠীর মানুষকে উন্নত জীবন-জীবিকার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

'সংস্কৃতি' সম্বলিত ইশতেহারের ৩.২৭ অনুচ্ছেদে 'বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে' অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার কথা সুনির্দিষ্টভাবে লিপি আছে।

আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে পৃষ্ঠা ৬

[ভারতের বিখ্যাত পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। গত ২৭ ডিসেম্বর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারটি ইংরেজিতেই হুবহু এখানে তুলে ধরা হলো- সম্পাদক]

BNP is Bangladesh's BJP, Hindus have no option but to vote for the Awami League, says civil society leader Rana Dasgupta

Whenever Bangladesh prepares to vote in its parliamentary elections - as it will once more on 30 December, its religious minorities slip into acute anxiety and fear. This is because they are violently targeted to polarise the electorate and also dissuade them from voting for Prime Minister Sheikh Hasina's Awami League. This Sunday, Hasina will cross swords with former prime minister Khaleda Zia's Bangladesh Nationalist Party, which heads an Opposition alliance that includes the Jamaat-e-Islami, a Muslim fundamentalist organisation.

The Jamaat despicably perpetrates violence against religious minorities, who constitute 11.8 percent of Bangladesh's electorate. Of the 11.8 percent, Hindus make up 10.8 percent, which is precisely why the Jamaat considers them as its principal foe. Are religious minorities living in dread of the 30 December election? Which of the two parties - Awami League or BNP - do Hindus and other minorities prefer? Are Hindu candidates in the fray?

Rana Dasgupta, general secretary of the Bangladesh Hindu Bouddha Christian Oikya Parishad, or Hindu-Buddhist-Christian Unity Council, is on hand to answer these questions. Counted among the prominent leaders of Bangladesh's civil society, he has also served as a prosecutor in Bangladesh's International Crimes Tribunal that was constituted in 2009 to investigate and try those responsible for the mass killings during Bangladesh's liberation movement of 1971.

Edited excerpts of an interview conducted over the phone follow: Sponsored by MGID

Celebs Who Gained Fame Only For Their Body Parts What is the significance of Bangladesh's 11th parliamentary elections for religious minorities, particularly Hindus?

In the past, from 1991 until 2014, it was our experience that minorities were targeted in the days preceding as well as after the elections. But for the first time, the [Bangladesh] Election Commission has directed law-enforcement agencies to provide security to religious minorities in both the pre- and post-election periods. This has resulted in a very good relationship between the administration and religious minority communities.

That said, there have been two incidents in which Hindus were targeted. Could you provide details of the incidents in which Hindus were targeted?

One house in Thakurgaon district and another five in Sonagachi village, Feni district, were burnt down. There have been incidents of Hindu leaders being threatened. That said, we feel the situation of minorities in this election, at least until now, is far better than that in the past. Who burnt the houses? Communal elements thrive in the Feni district. However, the person who has been arrested for setting the houses on fire belongs to the ruling Awami League. We don't yet know why he did it. Isn't it surprising that the accused in Feni district belongs to the Awami League, which is considered a pro-minority party?

As of now, we simply have no clarity why Awami League workers chose to burn down the houses of Hindus. But what you say is indeed true - the Awami League is generally considered protective of religious minorities.

Do religious minorities fear the return of the BNP?

Yes, minorities fear the BNP's return. This is because the Jamaat-e-Islami, which is part of the Jatiyo Oikyo Front [National United Front, the Opposition alliance], is an anti-liberation force [meaning it fought to crush the movement for the liberation of Bangladesh]. In 1971, in collusion with the Pakistani occupation army, the Jamaat committed genocide and war crimes. In fact, the International Crimes Tribunal described the Jamaat as a fascist organisation. So if the BNP-Jamaat coalition were to come to power, minorities will face negative consequences (read religious persecution).

Has any BNP leader tried to dispel the fear among minorities, like promising to provide security to them if the party were to come to power?

In the past, whenever the BNP-Jamaat coalition was in power, the Jamaat carried out attacks on religious minorities. It is the Jamaat's political outlook to turn out religious minorities from their hearth and home and make Bangladesh a Hindu-free country. It is their agenda to make Bangladesh like Pakistan or any West Asian country. As to your question, no, BNP leaders have not provided any assurances to religious minorities.

Isn't it true that after the BNP came to power in 2001, Hindus were persecuted on a massive scale?

Not only in 2001, but even earlier. When Khaleda came to power in 1991, religious persecution continued for 27 days. Between 2001 and 2006, when she was again in power, thousands of incidents of religious persecution took place.

After the Hasina came to power in 2008, a commission was constituted to investigate the violence perpetrated against minorities between 2001 and 2006. We reported 15,000 incidents of religious persecution to the commission. Out of those, the commission took note of 5,000 incidents and made its recommendations. Its report was submitted in 2012. Neither was the report made public, nor did the Awami League government implement any of the recommendations the commission made.

Then again, in the pre- and post-election period of 2014, when the International Crimes Tribunal was investigating war crimes, then too we witnessed large-scale targeting of religious minorities.

Given this background, would it be correct to assume that minorities will back the Awami League in the 2019 election?

Yes. In India, religious minorities have several options. Bangladesh's minorities have no alternative to the Awami League. There are two major players in Bangladesh - the Awami League and the BNP. There are several things going for the Awami League as far as minorities are concerned. For one, the Awami League led the fight for Bangladesh's liberation. Secularism still remains the party's principle. Also, in comparison to the BNP, the Awami League is more democratic.

The BNP believes in religious nationalism. It is like India's BJP or Pakistan's Muslim League (PML). Since BNP is Bangladesh's BJP, Hindus have no option but to vote for the Awami League.

How many minority candidates have the Awami League and the BNP fielded?

Our organisation has been appealing to all political parties to field minority candidates in proportion to their population. According to our population ratio, minorities should have 36 seats in the 300-member Parliament. But the Awami League has fielded 18 minority candidates and the BNP-led alliance seven. I think the Left parties have nominated between 30 and 34 minority candidates. Unfortunately, the Left parties will be left behind (in the electoral race). They have been reduced to being small organisations.

Do any of the 25 candidates fielded by the Awami League and the BNP have a good chance of winning?

Of the 25 candidates, we feel 20 to 21 of them should win.

Out of these 25 candidates, how many are Christians, Buddhists and Hindus?

There are three Buddhists, one Christian and 21 Hindus.

How many minority community MPs were there in the 10th Parliament?

There were 17.

Have all these 25 candidates been fielded in constituencies where religious minorities are numerous?

Twenty-one candidates have been fielded from constituencies where minorities make up between 20 and 50 percent of the electorate. Three or four candidates have been fielded from constituencies where minorities constitute less than 10 percent of the population.

Do both the Awami League and the BNP field minority candidates in those constituencies where minorities are numerous?

In only one minority-numerous constituency have both the Awami League and the BNP fielded a candidate. In other constituencies, if the Awami League has fielded a Hindu candidate, the BNP has nominated a Hindu.

Would it be right to say that many Muslims will be voting for minorities, particularly Hindu, candidates if you expect 21 of them to win?

True, very true.

So Bangladesh does have a culture of co-existence that the Jamaat wants to undermine.

Yes, you are right. In previous elections, there were hate speeches and communal propaganda. In this election, however, we don't hear such speeches.

Has your organisation tried to speak to the Jamaat to dissuade them from attacking minorities?

We haven't spoken to Jamaat-e-Islami as we feel that as it is an anti-liberation force, whose agenda is to turn out the minorities from their hearth and home, there is nothing to be gained from talking to them. But we have had talks with the BNP.

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

গত সংখ্যার পর

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫) দ্বিতীয় তফসীলে বিবৃত পরিষদ আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণীত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে:

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ;

জ) সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১) পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লল্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২) পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩) চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে :

চেয়ারম্যান - ১ জন

সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)- ১২ জন

সদস্য উপজাতীয় মহিলা)- ২ জন

সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)- ৬ জন

সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)- ১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

৪) পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫) পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬) পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭) পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮) (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯) (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩) সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪) নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে:

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপরে ঋণ ও অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্নিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন:

১) ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ '৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ '৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীর্ঘ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩) সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪) জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ মতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলে ভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫) এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে :

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬) (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭) যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮) রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্ধ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯) সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০) কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান: চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্যে সরকারী চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১) উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। পৃষ্ঠা ৬

নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়' সম্বলিত ৩.২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাহাত্তরের সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছে। একই সাথে বলেছে, 'স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তাতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও অনুন্নত সম্প্রদায়সহ সকল নাগরিকের সম-মর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত করেন।' আমরা আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে এর সাথে পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করে বলতে চাই, বিদ্যমান সংবিধান ৭২-র সংবিধান নয় এবং এ সংবিধান সকল নাগরিকের সম-মর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত করে না। তাই আমরা মৌল আদলে ৭২-র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আবারো উত্থাপন করছি।

ইশতেহারের এ অনুচ্ছেদে অন্যান্যের মধ্যে বিবৃত আছে-

● সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

● পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করার লক্ষে চুক্তির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। ক্ষমতায়নের এ ধারা চুক্তির শর্তানুযায়ী অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় বলা আছে-

● অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্তাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে

● জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে

● সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের শিক্ষা ও চাকরীর ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

● সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে

● ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

এ দেশের তিনটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অধিকতর গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিমুখীন ও প্রগতিশীল। এ সত্ত্বেও এদেশের সকল রাজনৈতিক দল প্রায় অভিন্ন সুরে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। এছাড়াও সিপিবিসহ রাজনৈতিক দলসমূহ আরো অনেক ব্যাপারে আমাদের ৭-দফা দাবির বেশ কয়েকটি দাবির সাথেও ঐকমত্য পোষণ করে অঙ্গীকার করেছেন। আমরা আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে এহেন অঙ্গীকার ঘোষণার জন্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে বলতে চাই, এহেন অঙ্গীকার ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষা এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ যৌক্তিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এহেন অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সোপানও গড়ে উঠেছে। আমরা আশা করি এবং নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতে চাই, আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যারাই সরকার গঠন করুক বা সংসদের বিরোধী দলে অবস্থান নিক তারা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যথাযথ বাস্তবায়নে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনমনে রাজনীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা গড়ে তুলবেন- এ কামনা করি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২) জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩) সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার জন্য তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪) নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫) নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬) জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

(গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্যে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭) (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃড়খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামারিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯) উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
(খ) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
(গ) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(ঘ) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(ঙ) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ
(চ) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
(ছ) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
(জ) সাংসদ, বান্দরবন
(ঝ) চাকমা রাজা
(ঞ) বোমাং রাজা
(ট) মং রাজা
(ঠ) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদের সভায় নেতৃবৃন্দ

সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করুন

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

নির্বাচনে যাতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রতি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ জোর দাবি জানান। সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত ব্যক্তিরা যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন বক্তারা। গত ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে আন্দরকিল্লাস্থ ঐক্য পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। সহ-সভাপতি প্রদীপ কুমার চৌধুরী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কাঞ্চন মহাজন, সজল চৌধুরী, তাপস দে, সাগর মিত্র, কানুরাম শর্মা, ডাঃ চন্দন দত্ত, অনুপ দাশ, রতিলাল রাহুল, সজীব বৈদ্য, সরোজ চৌধুরী, প্রবীর পাল, জুয়েল চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া নির্বাচন মনিটরিং করার জন্য তাপস হোড়কে আহ্বায়ক, এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরীকে সচিব ও চন্দন বিশ্বাস, বিজয় কুমার বড়ুয়া, ডাঃ অধর লাল চক্রবর্ত্তী, সজল চৌধুরী, তাপস দে, নিবাস দাশ সাগর, বিষ্ণুযশা চক্রবর্ত্তীকে সদস্য করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষিণ জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন

সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী ও ভূমিদস্যুদের কবল থেকে সংসদকে মুক্ত রাখতে ঐক্য পরিষদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত ২ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, বিগত ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি হয়ে ও থেকে যারা সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল, আমরা আশা করেছিলাম, এবারের নির্বাচনে দলনির্বিশেষে এসব বিতর্কিত ব্যক্তিরা এবারে দল ও জোটের মনোনয়ন থেকে বাদ পড়বে। কেউ কেউ বাদ পড়লেও বিতর্কিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই আবার প্রার্থী হিসেবে নানান দল ও জোট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়, এবারের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার ও পার্লামেন্ট গঠনের দাবিতে আমরা যেমনিভাবে সোচ্চার, একইভাবে রাজাকার, সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী ভূমিদস্যুদের কবল থেকে পার্লামেন্ট-কে মুক্ত রাখার সংগ্রামে আমরা আপামর গণতন্ত্রকামী, মুক্তিকামী জনগণের মতো-ই অবিচল ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচনে ইতোমধ্যে দেশের প্রধান সকল রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ২৬৪টি সংসদীয় আসনে ২৮১ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে তার মধ্যে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৮। ১৪-দলীয় জোটের শরীক অন্য ১৩টি রাজনৈতিক দল থেকে কোন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দেয়া হয় নি। জাতীয় পার্টি প্রাথমিকভাবে ২৩৩ আসনের মধ্যে ৪ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২৯৫টি সংসদীয় আসনে ৬৯৬ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে ১২ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে। তা ছাড়া জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের অন্য শরীক দলগুলো থেকে ৩ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আমরা অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র নিশ্চিত করার তাগিদে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষে বছরখানেক আগে থেকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে পার্লামেন্টে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে দাবি জানিয়ে এসেছি। এ যাবৎ মনোনয়ন নিয়ে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, বলা যায়, অতীতের তুলনায় তা' দৃশ্যতঃ খানিকটা ইতিবাচক। সেক্ষেত্রে চলতে চাই, সংখ্যালঘুদের অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্বের দাবিতে যে আন্দোলন আমরা করে এসেছি তা একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, ইতোমধ্যে নানান দল ও জোট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করছেন। তাদের সবার কাছে আমাদের দাবি-এসব ইশতেহারে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা ছাড়াও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিকরণ আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও ঘোষণা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যে নির্বাচন দুই অস্ত্রকে ভোঁতা করে দিয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এক শ্রেণির রাজনীতিক ভারত-বিদ্বেষকে হাতিয়ার করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকারকে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্র করে। তাদের পেছনে ছিল সেসব দেশ যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। পরাজিত পাকিস্তান পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টায় নামে।

পাকিস্তানি আমলে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম নির্মূল করতে ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করা হতো রাজনীতিতে। কিন্তু বাঙালি বিভ্রান্ত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম এগিয়ে চলে মুক্তির লক্ষ্যে। ভারতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যোগসাজস দেখাতে দাঁড় করানো হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু জনতার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে মাথা নত করতে হয় পাকিস্তান সরকারকে। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার, বাধ্য হয় নির্বাচন ঘোষণা করতে। যে নির্বাচনে জাতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি রায় ঘোষণা করে, যার অবিসংবাদিত পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার ভয়াল রূপ দেখেছিলেন, তাই স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধানই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম রূপে স্থান দেন, নিষিদ্ধ করা হয় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতির ওপর থেকে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি পাকিস্তানি ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে। যদিও গণআন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হয় বারবার। রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয় ভারত-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। নির্বাচন এলে এই দুই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এটাই যেন বাংলাদেশে রাজনীতি ও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা শত্রু সম্পত্তি আইনের শিকার, ভারত মুক্তিযুদ্ধে মিত্র হওয়ার পরও এই আইনটি অব্যাহত রাখা হয়। সম্পত্তি গ্রাস, হামলা, ধর্ষণ, বৈষম্য ও ধর্মান্তরকরণ সংখ্যালঘুদের দলে দলে দেশত্যাগে বাধ্য করে। নির্বাচন এলে তো কথাই নেই। সংখ্যালঘুরা দু'দিক থেকেই হামলার শিকার হয়। বিজয়ীরাও হামলা করে, পরাজিতরাও করে। উদ্দেশ্য মূলত এক–সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা যাতে জমি-সম্পত্তি গ্রাস করা যায়। তাই নির্বাচন এলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নির্বাচন এসেছে দুঃস্বপ্নের মতো, ২০০১ সালের নির্বাচন ১৯৭১ সালকেও হার মানাতে চেয়েছে। সংখ্যালঘুরা ভোট দান করুক নিজেদের স্বাধীন সিদ্ধান্তে, রাজনীতিকদের তা পছন্দ নয়।

২০০৮ সালে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটে। সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়, ভোট দেন নিঃশঙ্কচিত্তে। এবার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও এই ধারা পূর্ণতা লাভ করেছে। নির্বাচনী প্রচারণায় ভারত-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। প্রথমেই অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এই দুই ভয়ংকর প্রবণতাকে রুখে দেয়ার জন্য। অভিনন্দন জানাই রাজনৈতিক দলগুলোকে, তারা এই দুই অস্ত্র ব্যবহার করেননি। অভিনন্দন জানাই নির্বাচন কমিশনকে। তারা যথাযোগ্যভাবেই ব্যবস্থা নিয়েছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য এই দুই অস্ত্র কতখানি বিপদজ্জনক হয়েছে অতীতে, তা সবাই অনুধাবণ করতে পেরেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করছি। আস্থায় নিচ্ছি।

নির্বাচন হবে দেশ জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোয় এগিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে, রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিযোগিতা হবে উন্নয়ন ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার জন্য। প্রত্যেক মানুষের অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানে। সে ক্ষেত্রে অন্য একটি দেশ ও ধর্মকে হাতিয়ার করে প্রচারণা চালানো মানুষের অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার শামিল।

এবারের নির্বাচনে যে নজির স্থাপিত হলো তা যেন অব্যাহত থাকে, আমাদের রাজনীতিকদের এই নির্বাচন যেন পথ দেখায়। নির্বাচন কতখানি সুষ্ঠু বা অবাধ হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের রাজনীতিকরা যদি সচেতন থাকেন তাহলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোই শক্ত ভিত্তি পাবে। রাজনীতিকে স্বচ্ছ অবস্থান দেবে, প্রত্যেকটি মানুষ সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার জন্য। বাহাত্তরের সংবিধান তার প্রমাণ। তাঁকে হত্যা করে যারা একাত্তরের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, তারা আজও রাজনীতিতে সক্রিয়। কিন্তু এবারের নির্বাচনে জয় বাংলা আবার যেভাবে জেগে উঠেছিল, সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছে, তা অবশ্যই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য। যারা চান, ভারত জুজুর ভয় দেখিয়ে এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হলে, ক্ষমতায় যাওয়ার পথ মসৃণ হবে, তারা নিশ্চয়ই অনুধাবণ করবেন, দুই অস্ত্রই ভোঁতা হয়ে গেছে। তরুণ প্রজন্ম, যারা সামনের দিকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে এগুতে চান তারা এই রাজনীতি গ্রহণ করছেন না। যারা দেশকে ভালবেসে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এগুতে চান, তারাও এ রাজনীতি গ্রহণ করছেন না। পাকিস্তানকে অনেক পেছনে ফেলে বাংলাদেশ সামনে এগুচ্ছে। পাকিস্তানপ্রেমিরা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন। তারা পাকিস্তান সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন বাংলাদেশকে দেখে শিক্ষালাভ করার জন্য। পাকিস্তান যে পথে এগুচ্ছে তার পরাজয় ঘটেছে একাত্তরে।

এবারে নির্বাচনের আগে ও পরে কিছু সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় নগণ্য। প্রশাসনও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছে। অবশ্যই প্রশাসন প্রশংসার দাবিদার। রাজনীতি, ক্ষমতা থেকে সাম্প্রদায়িকতা এখনো দূর হয়নি, ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যালঘুরা আজও টার্গেট হচ্ছে। তবে এবারে একটি বড় হামলায় দেখা গেছে, সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি সংখ্যাগুরুরাও হামলার শিকার হয়েছেন। ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাকে নির্বাচনী প্রচারণায় রাজনীতিকরা হাতিয়ার করে এগুতে পারেননি। ভবিষ্যতে হয়তো আরো দুর্বল হয়ে যাবে এই ধারা। কিন্তু তা সত্বেও সামপ্রদায়িক রাজনীতি দুর্বল হয়ে গেছে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ক্ষমতার স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপোষ করার নজির আমাদের সামনে রয়েছে। এটাই এখনো বিপজ্জনক।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর-০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

ফেনীর সোনাগাজীতে আগুনে ভস্মিভূত বাড়িঘর — পরিষদ বার্তা

বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে। সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত করতে এসব হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী স্থানীয় ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এসব এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য প্রদান করেন।

ফেনী

ফেনী জেলার সোনাগাজী আলমপুর গ্রামে গত ১৬ ডিসেম্বর শিশির কুমার শীল এর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা অগ্নি সংযোগ করে। এখানে তারা ৫টি পরিবার বসবাস করতো এবং পাঁচ পরিবারে ৫টি ঘরে একসাথে অগ্নি সংযোগ করা হয়। বাড়ির পাঁচটি ঘর এবং ঘরে থাকা জিনিসপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ষ্টিলের আলমারি এবং আলমারিতে রক্ষিত জিনিসপত্র (নগদ টাকা স্বর্ণালংকার ও জায়গা সম্পত্তির দলিল) পুড়ে যায়। একমাত্র পরণের বস্ত্র ছাড়া কিছুই রক্ষা পায়নি।

সংবাদ পেয়ে তৎক্ষনাৎ ফেনী জেলা ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক জেলার নেতৃবৃন্দ সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা সাহায্য প্রদান করেন। ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে কেন্দ্রীয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী এবং মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য সোনাগাজীর আলমপুর গ্রামে যান এবং ঘটনস্থল পরিদর্শন করেন। তাদের সাথে ছিলেন ফেনী জেলা ঐক্য পরিষদের শুকদেব নাথ তপন এবং ফেনী জেলা ও সোনাগাজী উপজেলার নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) সাহায্য প্রদান করেন। এবং উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, এমন বর্বরতা ১৯৭১ এর পর হবে ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসী যতই শক্তিশালী হোক না কেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানান। তারা ফেনীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং ফেনী পৌর মেয়র বিশিষ্ট শিল্পপতি আলাউদ্দিন সাহেবের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করেন। জেলা প্রশাসক ঘর তৈরীর জন্য টিন ও আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের সামনের দিনগুলোতে সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৯ ডিসেম্বর রাত তিনটার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার দেলুয়া গ্রামে বসন্ত সরকার, নারায়ন সরকার ও সুধাংশু সরকারের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কয়েকটি বসতঘর ও খড়ের ডিন (গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত) পুড়ে যায়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ কুমার নাগ, যুগ্ম সাধারাণ সম্পাদক অশোক চৌধুরী এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম নেতা- এ্যাড. নাসির উদ্দিন এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন করেন।

সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ভোট কেন্দ্রে যেন না যায় সে জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এসব বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আরও জানা যায়, রসরাজ মন্ডলকে মিথ্যা মামলায় জোর পূর্বক ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার মূল ব্যক্তিই এঘটনার মূলনায়ক। উত্তম কুমার চক্রবর্ত্তী বলেন, নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহুর্ত্তে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা ও অগ্নি সংযোগ এর অর্থ তাদের আতঙ্কিত করা।

ঠাকুরগাঁও

গত ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার ভোরে ঠাকুরগাঁও সদগর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সিংগিয়া সাহাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পূজা উদযাপন্ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সাংগঠনিক সম্পাদক শুভাশীষ বিশ্বাস সাধন ও দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব কুমার দে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তাদের মধ্যে বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন। কৃষ্ণ ঘোষ নেতৃবৃন্দকে আরো জানান, এটা কোন দুর্ঘটনা বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট নয়, কারণ যে ঘরে আগুন লেগেছে সে ঘরে কোন বিদ্যুতের লাইন ছিল না। এটা কোন দুস্কৃতিকারীর অপকর্ম।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সহায়তায় ঘর পুন:নির্মাণ করে দেওয়ায় কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে দুস্কৃতিকারীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে, যে সব দুর্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ করেছে তাদেরকে অনতিবিলম্বে সনাক্ত করে বিচারের আওতায় এনে দোষীদের এমন শাস্তি দেওয়া হোক যাতে কোন সংখ্যালঘু আর নির্যাতিত না হয়।

কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার পূর্বধইর গ্রামে গত ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ পরিষদের মুরাদনগর উপজেলার নেতা কৃষ্ণ দাস ও রতন দাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করে নির্মমভাবে কুপিয়ে আহত করেছে সন্ত্রাসীরা।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ৩নং ওয়ার্ডের মজুমদারখীল গ্রামে গত ২৪ ডিসেম্বর সোমবার দুর্বৃত্তরা আশীষ সাহার দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তার দোকানের সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই দোকানের উপরই তার পুরো পরিবার নির্ভরশীল।

পিরোজপুর

গত ১৭ ডিসেম্বর সোমবার রাত পৌনে ১১টার দিকে পিরোজপুর জেলার সদর ১নং সংসদীয় আসনের বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ডা. তপন বসু'র চেম্বারে হামলা চালিয়ে তাঁকে মারধর করে গুরুতরভাবে আহত করে এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্যে হুমকি দেয়। পৃষ্ঠা ৬

সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি কর্তৃক ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সিংগিয়া, আখানগর ইউনিয়নের গুঞ্জরহাট সংলগ্ন ঝাড়গাঁও গ্রামে, চণ্ডিপুর গ্রামে, ফেনীর সোনাগাজির বগাদানা ইউনিয়নের আলায়ারপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে অগ্নি সংযোগ, সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরের কালীবাড়িতে মন্দির ভাংচুর এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে এক মানবনবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মিলন কান্তি দত্তের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, বিপ্লব কুমার দে, রজত কুমার সুর রাজু, কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু প্রমুখ। মানববন্ধনের সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, খ্রিস্টান এ্যাসোশিয়েশন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পী, যুব ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি রাহুল বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার তাপস বল।বক্তারা, এ ধরনের ঘটনার জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও নিন্দা জানান এবং দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর দাবি জানান।

সমন্বয় কমিটির সভায় নির্বাচনের পূর্বাপর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি

নিজস্ব বার্তা

পরিবেশকগত ২২ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠন-সমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির বর্ধিত সভায় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে।অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের (সভাপতি, জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কমিটির সমন্বয়ক বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর উপর আলোচনায় অংশ নেন হিউবার্ট গোমেজ (খ্রিস্টান এসোসিয়েশন), ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু (সাধারণ সম্পাদক, বুড্ডিষ্ট ফেডারেশন), ডঃ প্রভাষ রায় (সভাপতি, জাতীয় হিন্দু মহাজোট), মিলন কান্তি দত্ত (সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ) কাজল দেবনাথ (সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ), শংকর সরকার (মহাসচিব, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ) শিপন রবিদাস প্রাণকৃষ্ণ (মহাসচিব, বাংলাদেশ রবিদাস ফোরাম), শিল্পী রাণী রবিদাস (বাংলাদেশ রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ) রঘুপতি সেন ভোলানন্দ গিরি আশ্রম ট্রাষ্ট), বিমল চক্রবর্তী (ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি), বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস (মহাসচিব, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার), রামানন্দ দাস (মহাসচিব, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চয়েত ফোরাম), রাহুল বড়ুয়া (সভাপতি, যুব ঐক্য পরিষদ) প্রমুখ। সভায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উত্থাপিত দাবিসমূহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সন্নিবেশিত হওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে এ মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, একাদশ জাতীয় সংসদে সরকারি দল ও বিরোধী দল নিজ নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।সভায় গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় দেশকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার ও সংসদ গঠনের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২